অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম:

"পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের সীমহীন বৈষম্য মূলক আচরনের ফলেই পূর্ববাংলায় বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল"-

(ক) পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা:

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনই লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ্য ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরন করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিনতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক বৈষম্য: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণ-পরিষদে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রি উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% বাঙালি হলেও একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমল ছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ২৫%-৪৭% অতিক্রম করেনি। এ সময়ে মোট ২২৯ জন কেন্দ্রিয় মন্ত্রি, উপমন্ত্রি ও প্রতিমন্ত্রির মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৯৫ জন। আর ৯ জন সরকার প্রধানের মধ্যে মাত্র ৩ জন (খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দি ও মোহাম্মদ আলী বগুড়া) ছিলেন পূর্ব বাংলার।

Scanned with CamScanner

সময়ের হিসেবে ২৪ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর (২৫% সময়) পূর্ববাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-৬৯) মন্ত্রিসভার মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ২২ জন (৩৫.৪৮%), তবে এসব বাঙালিদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয় দায়িত্ব পাননি।

(খ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্যের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষন:

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন স্তরে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের মন্ত্রিপরিষদ, পররাষ্ট্র, কৃষি, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মত গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রনালয় ও বিভাগের মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি। বাঙালি ছিলেন মাত্র ৩ জন, বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৬৩

পর্যন্ত ৩৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন (৩৬.৪%) ছিলেন বাঙালি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ২১৮ জন (৬৩.৮%)। কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মচারিদের মধ্যে ৮৪% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৬% ছিল বাঙালি।

১৯৬৬ সালের তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের হার নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:

--পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রিয় চাকুরে ১৯৬৬

খাত	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট	১৯%	৮১%
প্রতিরক্ষা	৮.১%	৯১.৯%
শিক্ষা	২৫.৭%	৭৪.৩%
স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
শিল্প	২৭.৩%	৭২.৭%
তথ্য	২০.১%	৭৯.৯%
স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
কৃষি	২১%	৭৯%
আইন	৩৫%	৬৫%

Scanned with CamScanner

কেন্দ্রিয় সরকারের চাকরিতে নিয়োগ এর ক্ষেত্রে আরো কিছু বৈষম্য নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন কেন্দ্রিয় আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রন দফতরে ৮৭ জন এক্সিকিউটিভ অফিসার এর মধ্যে মাত্র ১৬ জন ছিল বাঙালি, ৪৫ জন সহকারী আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১৫ জন আর পশ্চিম পাকিস্তানি ছিল ৩০ জন।

সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য –
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিরা অবহেলিত ছিল। পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ ছিলেন বাঙালি এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রযুক্তিগত বা রসদস্থাপনার পদে ছিলেন। খুব অল্প সংখ্যক বাঙালি অফিসার আদেশদানকারী পদ লাভের সুযোগ পেতেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করত বাঙালিরা পশতুন বা পাঞ্জাবিদের মত "সাহসী" নয়। পাকিস্তানের বাজেটের একটি বিশাল অংশ সামরিক খাতের বরাদ্দ থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান এর সুফল সামান্যই পেত। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর

নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি আরো বাড়িয়ে দেয়।

তাছাড়া সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি অনুসরন করা হয়, তাতে ৬০% পাঞ্জাবি ৩৫% পাঠান এবং মাত্র ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারন করা হয়। ১৯৫৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, সামরিক বাহিনীর মোট ২২২১ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৮২ জন। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। আইয়ুবখানের শাসনামলে মোট বাজেটের ৬০% সামরিক বাজেট ছিল। এর সিংহভাগ দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে, অথচ, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রতি অবহেলা দেখানো হতো।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থ-সামাজিক বৈষম্যের তুলনামূলক বিশ্লেষন:

অর্থনৈতিক বৈষম্য: পূর্ব পাকিস্তান সবচেয়ে বেশী বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

Scanned with CamScanner

প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রন ছিল। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তান তিনটি পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩৬% ও৬৪%। ৯৫০ কোটি ও ১৩৫০ কোটি রূপি। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। রাজধানী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫৬ সালে করাচির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় ৫৭০ কোটি টাকা, যা ছিল সরকারি মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয়ের হার ছিল ৫.১০%। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদ নির্মানের জন্য ব্যয় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা, আর ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় করা হয় ২৫ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বর্ন ও টাকা-পয়সা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের যেতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বর্ন ও টাকা পয়সা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে সরকারের বিধি নিষেধ ছিল।

সামাজিক বৈষম্য: পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারন করে। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরনের সমাজ জীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসিদের জীবন যাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। বাঙালিরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না পারে এজন্য তাদের কে অভাব অনটন ও রোগগ্রস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো। যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত

(ঘ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা –

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য: শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার কোনো উন্নয়ন করেনি। শিক্ষা খাতে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৮৪ মিলিয়ন

রুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৭৭ মিলিয়ন রুপি। পাকিস্তানের সর্বমোট ৩৫ টি বৃত্তির ৩০টি পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং মাত্র ৫ টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

সামাজিক বৈষম্য: রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত হাসপাতাল, ডাকঘর টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করত। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য: পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসি ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬%। অপরদিকে ৪৪% জনসংখ্যার পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। উর্দুভাষী ছিল মাত্র ৩.৫%। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা ও সুসমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি কে ধ্বংস দিতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত হানার জন্য রবীন্দ্র সংগীত ও রচনাবলি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখী বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে হিন্দু প্রভাব বলে উল্লেখ করে সেখানেও

চেষ্টা করা হয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায়নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ব বাংলা কে শোষন করে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বানিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ব বাংলা। অবশেষে বাঙালিদের কাছ থেকে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

Scanned with CamScanner